দেয়াড়া গণহত্যা

গৌরাঙ্গ নন্দী

১৯৭১
গণহত্যা ও নির্যাতন
আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী

১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা : ১৯

গ্রন্থমালা সম্পাদক
মুনতাসীর মামুন

সহযোগী সম্পাদক
মামুন সিদ্দিকী

প্রকাশকাল
চৈত্র ১৪২১/মার্চ ২০১৫

দেয়াড়া গণহত্যা [Deara Genocide]

©
১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
[1971 : Genocide-Torture Archive & Museum Trust]
বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী
[Bangladesh History Congress]

প্রকাশক
১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
৩৩৪ শের-এ-বাংলা রোড, ময়লাপোতা মোড়, খুলনা ৯১০০
itihassammilani.bd@gmail.com, archivemuseum1971@gmail.com
০১৮১৬২৮৮৬৭৪, ০১৭১৫৪৫৭৩৮২, ০১৭১১২১৭১১১

মুদ্রণ
ওয়ান স্টপ প্রিন্টশপ, ৬০/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

গ্রন্থ নকশা ও প্রচ্ছদ
তারিক সুজাত

পরিবেশক
জার্নিম্যান বুকস্
সুবর্ণ

মূল্য : ১২০ টাকা

ISBN : 978-984-91549-9-0

দি ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড প্রদত্ত অনুদানের
সহায়তায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে

গ্রন্থমালা প্রসঙ্গে

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা-নির্যাতন। একের অধিক মানুষ হত্যাকেই চিহ্নিত করা হয়েছে গণহত্যা হিসেবে। নির্যাতনের অন্তর্গত শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ ও দেশত্যাগে বাধ্য করা। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বগাথা সবচেয়ে বেশি আলোচিত এবং তা স্বাভাবিক। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোনো একটি দেশে এতো অল্প সময়ে এতো হত্যাও হয়নি। যদিও আমরা বলি ৩০ লক্ষ শহীদ হয়েছেন কিন্তু মনে হয় সংখ্যাটি তারও বেশি হবে। গণহত্যা, বধ্যভূমি, নির্যাতন মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে একেবারে নেই তা নয় কিন্তু গুরুত্ব ততোটা এর ওপর দেয়া হয়নি। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগের ব্যাপারটি আড়ালে পড়ে যায়। কিন্তু ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে গণহত্যা হয়েছিল তার ওপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চলচ্চিত্র, সাহিত্য, শিল্পকলা সব ক্ষেত্রে এখনও সেই গণহত্যার কথা ফিরে আসে। যে কারণে ইউরোপে ফ্যাসীবাদ আর নাজিবাদ জায়গা করে নিতে পারেনি। আমাদের এখানে তা হয়নি দেখে গণহত্যার সংখ্যা নিয়ে এখনও অনেকে প্রশ্ন করার সাহস রাখেন এবং হত্যাকারীদের সমাজ ও রাজনীতিতে এমনভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে তারা একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। দেশে সামরিকবাদ, জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ আবারও শেকড় গেড়েছে।

এ দেশে গণহত্যা-নির্যাতন চালিয়েছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর, শান্তি কমিটির সদস্যরা। জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ থেকেই মূলত এসব বাহিনীতে গেছে কর্মিরা। সুখের বিষয়, এসব মানবতাবিরোধীদের বিচার শুরু হয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে।

দেশের আনাচে-কানাচে রয়েছে অসংখ্য বধ্যভূমি ও গণকবর। নির্যাতনের শিকার বহু নারী-পুরুষ এখনও রোমহর্ষক স্মৃতি রোমন্থন করেন। সেসব গণহত্যার বৃত্তান্ত, বধ্যভূমি ও গণকবরের কথা, এমনকী নির্যাতনের কথা বিজয়ের গৌরব-ভাষ্যে উপেক্ষিত থেকে গেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায়, অনুপুঙ্খ ইতিহাস অনুসন্ধানে এসবের গুরুত্ব অপরিসীম। গণহত্যা, বধ্যভূমি ও নির্যাতনের ইতিহাস সংরক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত সংগ্রহশালা তৈরি আমাদের জাতীয় কর্তব্য। এর মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উঠে আসার পাশাপাশি উত্তরপ্রজন্মের মাঝে মুক্তিসংগ্রামের মর্মবাণী প্রতিভাত হবে। এই তাগিদ থেকে গড়ে ওঠেছে '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট'। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধকালে গণহত্যা, বধ্যভূমি, গণকবর ও নানামুখী নির্যাতনের দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ এবং জাতির সামনে মুক্তিযুদ্ধের মর্মকথা তুলে ধরা। এর পাশাপাশি একটি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, শোষণমুক্ত রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণের বাণী প্রচার করা এ প্রতিষ্ঠানের আদর্শ।

এরই আলোকে এ যাবৎকালে প্রাপ্ত গণহত্যা ও বধ্যভূমির ওপর ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটি গণহত্যার ইতিবৃত্ত তুলে ধরা '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা'র উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি পুস্তিকা লেখকের স্বকীয়তা বজায় রেখেও নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে প্রণীত হবে। এর বিষয়-বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে স্থানটির ভৌগোলিক অবস্থান, তৎকালীন অবস্থা, গণহত্যার পটভূমি, গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ, শহীদ ও নির্যাতিতদের নাম-পরিচয়, ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক ভাষ্য, গণহত্যায় জড়িতদের নাম-পরিচয়, বধ্যভূমি সংরক্ষণের প্রয়াস, বর্তমান অবস্থা এবং সার্বিক মূল্যায়ন। প্রতিবেদনধর্মী হলেও পুরো কাজটি গবেষণামূলক। উল্লেখ্য, গণহত্যায় সব শহীদের নাম কোথাও পাওয়া যায় না। এখানে প্রতিটি গণহত্যায় যে কজনের নাম পাওয়া গেছে শুধু তাই উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থে অনেক আলোকচিত্র/শিল্পীদের চিত্রকর্মের প্রতিলিপি ব্যবহার করা হয়েছে, যা নেয়া হয়েছে অন্তর্জাল ও বিভিন্ন বই থেকে। মুক্তিযুদ্ধের ছবি যেহেতু জনস্বার্থে ব্যবহৃত হয় সে জন্য কখনও কেউ আপত্তি তোলেননি। শিল্পী ও আলোকচিত্রিদের ঋণ আমরা স্বীকার করছি।

এ কাজের স্বাতন্ত্র্য এখানে যে, লেখক গণহত্যা ও বধ্যভূমি স্থলে সরেজমিনে গিয়ে, খোঁজ-খবর নিয়ে, গণহত্যা সংশ্লিষ্টজনের সঙ্গে কথা বলে, পর্যবেক্ষণ করে– সেই অশ্রু-শোণিতের দিনগুলিকে অন্তরে অনুভব করে তবেই প্রণয়ন করেছেন এই ভাষ্য। সবার হৃদয় নিংড়ানো কথামালা যেন এখানে মেলে ধরেছে ভয়াল দিনের স্মৃতি। ফলে এর মধ্য দিয়ে যে সেই গণহত্যা ও নির্যাতনের কথা অকৃত্রিমরূপে উঠে এসেছে– এ ভরসা আমরা করি।

বর্তমান পুস্তিকা *দেয়াড়া গণহত্যা*য় খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলার দেয়াড়া গ্রামের মানুষদের ওপর সংঘটিত গণহত্যা-নির্যাতনের বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন সাংবাদিক গৌরাঙ্গ নন্দী। নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করেও তিনি দেয়াড়া গণহত্যার ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি এর বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা করেছেন। আমাদের এই প্রয়াসে যুক্ত হওয়ার জন্যে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যা-নির্যাতন, বধ্যভূমি ও গণকবর সংক্রান্ত বিদ্যাচর্চায় এ গ্রন্থমালা বিশেষ আলো ফেলবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে শুধু গৌরব নয়, মুক্তিযুদ্ধের বেদনাবিধূর কাহিনী তুলে ধরতে পারলে মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস উঠে আসবে। এই বেদনা ও গৌরবের কাহিনী বয়ানের মাধ্যমে মানবতার জয়গান করে সম্প্রীতির সমাজ নির্মাণ আমাদের লক্ষ্য। মুক্তিযুদ্ধের ভাবাদর্শও তো তাই।

মুনতাসীর মামুন
গ্রন্থমালা সম্পাদক

ভূমিকা

বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর বড় গর্ব ও অহঙ্কারের ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ নামের স্বাধীন ভূখণ্ড। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা এই দেশটি পেয়েছি। রাষ্ট্রটির জন্মপর্বে ঔপনিবেশিকতার ধাঁচের শাসকগোষ্ঠী তো বটে, এই ভূখণ্ডের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এর বিরোধিতা করে। ফলে বিরোধিতাকারী গোষ্ঠীকে সশস্ত্র লড়াইয়ে পরাস্ত করেই বিজয় ছিনিয়ে আনতে হয়। লড়াইয়ের ময়দানে তারা হেরে যায় বটে, তবে অনেক মর্মন্তুদ হৃদয়স্পর্শী ঘটনার জন্ম দেয়। ঘটনাগুলোর একটি গণহত্যা। এর ভয়ঙ্করতা প্রকাশ করতে গিয়ে কবি সিকানদার আবু জাফর ১৯৭২-এর ২০ জানুয়ারি 'পূর্বদেশ' পত্রিকায় লেখেন, 'গ্রামে গ্রামে বধ্যভূমি তার নাম আজ বাংলাদেশ।'

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামের এই দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলা খুলনায়ও (বর্তমানের খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) ব্যাপক গণহত্যা ঘটনা ঘটে। এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী খুলনার চুকনগরে স্বল্পতম সময়ে বিপুলসংখ্যক মানুষকে হত্যা করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সংখ্যাটি দশ হাজারের কম নয়। তবে, গণহত্যার শিকার এই মানুষদের প্রায় সকলেই এলাকার বাসিন্দা না হওয়ায় গুটিকয়েক ছাড়া কাউকেই শনাক্ত করা যায়নি। আবার, দু'দল প্রশিক্ষিত সেনা– একদিকে মিত্র বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধা এবং অন্যদিকে পাকিস্তানি সেনাদের মধ্যে দেশের মধ্যেকার ভয়াল যুদ্ধের ঘটনাটিও এই খুলনায় ঘটে, যা শিরোমনি বা খুলনার ট্যাঙ্কযুদ্ধ নামে পরিচিত।

একাত্তরের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণের পর থকে সারাদেশেই আক্রমণের ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় একই সময়ে খুলনার খালিশপুরে অবাঙালিরা বাঙালিদের ওপর নির্বিচারে হত্যা করে। এপ্রিল এবং মে মাস জুড়ে খুলনাঞ্চলে চলেছে অবাধ লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা। আর অবশ্যম্ভাবী হিসেবে এই আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা। একদিকে অত্যাচার; অন্যদিকে পলায়নপর মানুষের মিছিল; বিশেষত: হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা ছুটে পালাতে থাকে– গন্তব্য প্রতিবেশী দেশ ভারত। লুটেরা-আক্রমণকারীদের অত্যাচারে ঘর-বাড়ি ছেড়ে প্রাণ নিয়ে ছুটে পালানো ভীতসন্ত্রস্ত মানুষদের পাকিস্তানি হানাদাররা এবং তাদের এদেশীয় সহযোগীদের নিয়ে নির্বিচারে হত্যা

করেছে। হত্যা-লুটতরাজ-অগ্নিসংযোগের ভয়াবহতায় মানুষ আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সংগঠিত হয়েছে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের। গড়ে উঠেছে মুক্তিসেনার দল। বলাবাহুল্য, দেশের যুবাগোষ্ঠী এ কাজে এগিয়ে আসে।

জুলাই-আগস্ট মাসে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা অনেক বাড়ে। তারা মুহূর্তের মধ্যে শত্রু সেনাদের ওপর আক্রমণ করে তাদের ডেরা তছনছ করে দিতে শুরু করে। সে কারণে পাকিস্তানি সেনা ও তাদের এদেশীয় সহযোগী শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর বাহিনী মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। এরকম একজন মুক্তিযোদ্ধাকে খুঁজতে এসে তারা দেয়াড়া গ্রামে নির্বিচারে গণহত্যা চালায়।

গণহত্যার এই ঘটনাটি এলাকায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। যে মুক্তিযোদ্ধাকে খুঁজতে এসে এই গণহত্যার ঘটনা ঘটে স্বাধীনতা-উত্তর কালে সেই মুক্তিযোদ্ধা এই ঘটনার বিচার দাবি করে থানায় মামলা দায়ের করেছিলেন। কিন্তু মামলাটি মামলা হিসেবেই থেকে যায়। আর গণহত্যার বিষয়টিও মানুষ কেমন যেন ভুলতে শুরু করে। ঘটনাটি আবারও আলোচনায় আসে একটি কারখানা তৈরি করার সময় একটি গণকবর আবিষ্কৃত হওয়ায়। স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় এটি নিয়ে লেখালেখিও হয়। তবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখিত বইয়ে দেয়াড়া গণহত্যার বিষয়টি নামমাত্রই এসেছে।

সিদ্ধান্ত হয়, '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর'-এর পক্ষ থেকে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যতগুলো গণহত্যাস্থল চিহ্নিত হয়েছে, এর প্রতিটি গণহত্যাস্থলের ওপর এক একটি প্রতিবেদনমূলক পুস্তিকা প্রণীত হবে। এরই অংশ হিসেবে *দেয়াড়া গণহত্যা* পুস্তিকা প্রণীত। যে কাজটি করবার জন্যে আমি মনোনীত হই। গ্রন্থমালার সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্টরা আমার ওপর এই আস্থা রাখার জন্যে তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, আর এই গৌরবজনক কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত।

পুস্তিকা প্রণয়নের জন্যে *দেয়াড়া গণহত্যা* বিষয়ে আরও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা পড়ে। সেদিনের সেই নির্মম গণহত্যা ও নির্যাতন পর্ব জানা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার লক্ষ্যে একাধিকবার ওই এলাকায় গিয়েছি, অনেক মানুষের সাথে কথা বলেছি। শহীদ পরিবারের মানুষগুলো এখনও সজলচোখে সেদিনের কথা বলেন, আবেগাপ্লুত হয়ে কথা হারিয়ে ফেলেন। স্বজন হারানোর বেদনাক্রান্ত স্মৃতি মনে পড়ে ব্যথাতুর হন। শহীদের সন্তান আফজাল

হোসেন কষ্ট চেপে রেখে একাজে আমাকে প্রশ্নাতীত সহযোগিতা করেছেন। সাংবাদিক মনিরুল ইসলাম এই গণহত্যার কথাটি আমাকে প্রথমে জানান এবং এর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে অশেষ সহযোগিতা করেছেন। আফজাল হোসেন এবং মনিরুল ইসলামের সহযোগিতা ছাড়া এই কাজটি আমি সম্পূর্ণ করতে পারতাম না। তাঁদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না।

কাজটি করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সর্বদা উৎসাহ যুগিয়ে চলা মানুষগুলোর মধ্যে '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট' পরিচালনা কমিটির সম্পাদক ডা. শেখ বাহারুল আলম অন্যতম। তাঁকেসহ অন্য সকলকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা।

এ পুস্তিকায় ব্যবহৃত ছবিগুলো তুলেছেন কামরুল আহসান। তাঁকে ধন্যবাদ।

ফেব্রুয়ারি ১০, ২০১৫

গৌরাঙ্গ নন্দী
gouranga.nandy@gmail.com

ভৌগোলিক অবস্থান

খুলনা জেলার উত্তর-পূর্ব দিকে দিঘলিয়া উপজেলার অবস্থান। উপজেলার পূর্বদিকে খুলনার তেরখাদা উপজেলা, পশ্চিমে যশোরের অভয়নগর উপজেলা এবং খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ–কেএমপি'র খান জাহান আলী থানা ও দৌলতপুর থানা, দক্ষিণে কেএমপি'র খালিশপুর থানা ও রূপসা উপজেলা এবং উত্তরে নড়াইলের কালিয়া উপজেলা এবং যশোরের অভয়নগর উপজেলা। এর আয়তন ৭৭ দশমিক ১৭ বর্গকিলোমিটার।

এই উপজেলায় দেড় লাখের মতো মানুষ বসবাস করেন। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী উপজেলার জনসংখ্যা এক লাখ ২০ হাজার ৭৮২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৬৩ হাজার ৭৫১ এবং নারী ৫৭ হাজার ৩১। ইসলাম ধর্মের অনুসারী ৯৯ হাজার ৩৫২ জন, সনাতন ধর্মের অনুসারী ২০ হাজার ৮৫৯ জন, বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ৫৫৮ জন এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারী ১৩ জন।

ভৈরব, চিত্রা ও নবগঙ্গা এই উপজেলার প্রধান নদী। খুলনা জেলা শহর ও এই উপজেলার মধ্যে সীমানা বিভাজনকারী নদী ভৈরব। ১৯৮৭ সালের ১২ জানুয়ারি দিঘলিয়া থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়। ভৈরবের পূর্বপাড়ের এই এলাকাটি তুলনামূলকভাবে পশ্চাদপদ। ছিল অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা; অবশ্য, সাম্প্রতিককালে যোগাযোগ ব্যবস্থার বেশ উন্নয়ন ঘটেছে।

উপজেলার সেনহাটি ইউনিয়ন অত্যন্ত প্রাচীন এবং বর্ধিষ্ণু জনপদ। সেনহাটি শিববাড়ি কালি মন্দির, বাসুদের মন্দির, পানিহাতি খানজাহান আলী সীমানন্দ দিঘী প্রাচীন নিদর্শন। সেনহাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি প্রায় দেড়শ' বছর আগের; ১৮৭৭ সালে এটি স্থাপিত। নীতি-ধর্মের কবি হিসেবে পরিচিত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এই উপজেলার কৃতী সন্তান। এখানকার জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ শতাংশ মানুষ অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন।

জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি। কৃষি ভূমির মালিকানা ৪৭ দশমিক ২৪ শতাংশ মানুষের হাতে। ভূমিহীন ৫২ দশমিক ৭৬ শতাংশ মানুষ। প্রধান কৃষি ফসল ধান, গম, তিল, পান প্রভৃতি। এখানে আগে আখ ও পাটের ভালো ফলন ছিল। এখন তা প্রায় বিলুপ্তির পথে। আম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল, কলা, পেঁপে প্রধান ফল-ফলাদি। আগে এই অঞ্চলে বেশ পালকির ব্যবহার ছিল, ছিল গরুর গাড়িও; যা এখন আর দেখা যায় না বললেই চলে। এলাকাটিতে কুটির শিল্পের বেশ প্রসার ছিল, তাও আজ নিঃশেষ প্রায়।

দিঘলিয়া উপজেলায় ৪টি ইউনিয়ন। এগুলো হচ্ছে দিঘলিয়া, সেনহাটি, গাজীরহাট ও বারাকপুর ইউনিয়ন। এগুলো সবই ভৈরবের পূর্বপাড়ে। ভৈরবের পশ্চিমপাড়ে খুলনা শহরের আড়ংঘাটা থানাধীন দু'টি ইউনিয়ন– আড়ংঘাটা ও যোগীপোল ইউনিয়ন দু'টি উপজেলা সংক্রান্ত কার্যক্রমগুলো দিঘলিয়া উপজেলার অন্তর্ভুক্ত; তবে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যক্রম অর্থাৎ থানা খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ– কেএমপি'র আড়ংঘাটা থানা নিয়ন্ত্রণ করে।

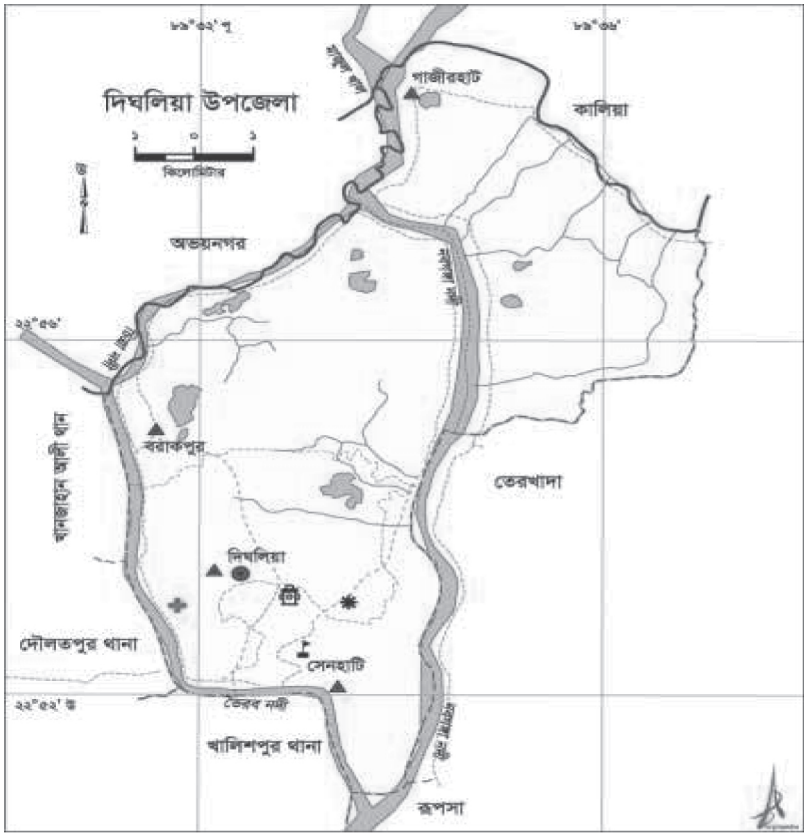

দিঘলিয়া উপজেলা *সৌজন্যে বাংলাপিডিয়া*

ভৈরব নদীর পূর্বপাড়ে দিঘলিয়া ইউনিয়নের একটি গ্রাম দেয়াড়া। পায়ে হাঁটা পথেই ছিল মানুষের চলাচল। স্থানটি শহর থেকে শুধুমাত্র নদী বিভাজনকারী দূরত্বে হওয়ায় উপজেলার অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে খুলনা শহরের সাথেই এই এলাকার মানুষের যোগাযোগ বেশি। নদীর পাড়েই ছিল অবাঙালি বিহারিদের বাস। স্থানটি বিহারি কলোনী নামে পরিচিত। নদীর অপর পাড়ে দৌলতপুর-খালিশপুরের জুটপ্রেস। উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের জন্যে রয়েছে সড়ক পথ। প্রায় কাছাকাছি এলাকায় তিনটি খেয়াঘাট। শহরের সাথে যোগাযোগের জন্যে এলাকাবাসী এসব খেয়াঘাটগুলো ব্যবহার করেন।

স্থানটির তৎকালীন অবস্থা

ভৈরব নদীর পাড় ঘেঁষেই বসতি। গাছ-পালা ঘেরা একটি জনপদ। চলাচলের জন্যে মাটির রাস্তা। গ্রামের নাম দেয়াড়া। এরই এক কোণে বিহারি কলোনী। এখানে অবাঙালিরা বসবাস করতেন। এই মানুষগুলো ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এদেশে আসেন। বিহারি নামেই পরিচিত। শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের অনুসারী হওয়া ছাড়া এই মানুষগুলোর সাথে এখানকার বাঙালিদের সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক-সামাজিক কোনো আচার-অভ্যাসের মিল ছিল না।

কলোনীর খেয়াঘাট, নগরঘাটে খেয়াঘাট এবং দৌলতপুরে খেয়াঘাট ছিল নদীর পশ্চিম পাড়ের খুলনা শহরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম। জায়গাটি ছিল জুটপ্রেস, পাটের গুদাম এলাকা। এসব প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরাই দেয়াড়া ও আশেপাশের এলাকায় বাস করতেন। আবার নদীর এপাড়ে অর্থাৎ দৌলতপুরেও ছিল অনেকগুলো জুটপ্রেস। এপারে জুটপ্রেস, ওপারে পাটের গুদাম। একারণে শ্রমিকদের বাসও ছিল দিঘলিয়ায় বেশি। এলাকাটি একাত্তরে দৌলতপুর থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অবাঙালি বিহারিরাও জুটপ্রেস ও জুটমিলের শ্রমিক এবং পাটের গোডাউনের পাহারাদার হিসেবে কাজ করতেন। দেয়াড়া গ্রামের নদীর কাছাকাছি একটি জায়গায় অনেক বিহারিরা বাস করতেন। একারণেই জায়গাটি বিহারি কলোনী নামে পরিচিত ছিল। এখনও নামটি আছে, তবে এখন সেখানে বিহারিরা বসবাস করে না বললেই চলে। তবে কেউ কেউ আছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে, এদিক-ওদিক।

১৯৪৭-এ সেই সময়ের খুলনা জেলায় (বর্তমানের খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) রাজনীতি-অর্থনীতি-সামাজিক কর্মকাণ্ডে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব ছিল। সাতচল্লিশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে খুলনা জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় রাজনীতিতে নেতৃত্বদানকারী এবং সমাজে অর্থ-বিত্তে প্রভাবশালী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের এক বিশাল অংশ খুলনাঞ্চল ছেড়ে ভারতে চলে যান। আবার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের একটি অংশ খুলনায় আসেন। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হওয়ায় নিরাপত্তা ও স্বস্তির আশায় এই স্থানান্তর ঘটে। খুলনাঞ্চলের অনেক সনাতন ধর্মাবলম্বী পরিবার ভারতে ইসলাম ধর্মাবলম্বী পরিবারের সাথে সম্পত্তি বিনিময় করেও স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

আবার খুলনার অনেক ধনাঢ্য হিন্দু পরিবার তাদের সম্পদ-সম্পত্তি ফেলে ভারতে পাড়ি জমান। এসব ঘটনার মধ্যে দিয়ে খুলনার রাজনীতিতে মুসলিম লীগ নেতা খান এ সবুরের রাজনৈতিক জমিন পাকাপোক্ত হয়। সবুর ও তাঁর অনুসারীদের পাটের ব্যবসার উপরও নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ছিল। দৌলতপুরে তাদের জুটপ্রেস ছিল। দৌলতপুরের অপর পাড় দিঘলিয়ায় তাঁর ভক্ত-অনুসারীদের সংখ্যাও ছিল বেশ। অন্যদিকে, ভারত হতে স্থানান্তর হয়ে আসা 'বিহারি'রা ছিল ভাবাদর্শগতভাবে মুসলিম লীগ বা পাকিস্তানের সমর্থক।

একাত্তরে এই অঞ্চলে নকশালপন্থী রাজনীতির বেশ প্রভাব ছিল। ১৯৭০-এর নির্বাচনে এখান থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভায় সদস্য নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগ নেতা ডা: মুনসুর আলী এবং প্রাদেশিক আইন সভায় সদস্য নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগ নেতা মো: মহসীন।

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ

একাত্তরে দেয়াড়া ছিল একটি শান্ত-ছায়াঘেরা নিরিবিলি গ্রাম। পায়ে চলা মেঠোপথ ছিল যাতায়াতের মাধ্যম। নানা ধরনের ফলজ গাছ-গাছালিতে পূর্ণ অঞ্চল। এখানকার বসবাসকারীদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের অনুসারীরাই ছিল বেশি। দেয়াড়ার পাশের গ্রামে ছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়ের বাস। আর দেয়াড়া গ্রামের নদী তীরবর্তী অংশে ছিল বিহারিদের বাস। এরা ১৯৪৭-এর পর ভারত থেকে আসে।

ধর্মকে ভিত্তি করে ১৯৪৭-এ পাকিস্তান ও ভারত নামের দুটো রাষ্ট্রের পত্তন হয়। এই পাকিস্তানের দু'টো অংশের একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তান, যা আজকের বাংলাদেশ। পাকিস্তানে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ভালো থাকবে এই আশায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা পূর্ব পাকিস্তানে আসে। সাধারণভাবে এদেরকে বিহারি বলা হতো। এদেরই একটি অংশ খালিশপুর-দৌলতপুরের ওপারে দেয়াড়ায় বসবাস শুরু করে। একারণে এই এলাকাটিকে বিহারি কলোনি বলা হত।

সঙ্গতকারণেই এই মানুষগুলো (বিহারি) পাকিস্তানের প্রতি অনেক বেশি দুর্বল ছিল। এই গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা খালিশপুরে বসবাসকারী মতিউল্লাহ ছিল মুসলিম লীগ নেতা খান এ সবুরের একান্ত অনুসারী ও আস্থাভাজন। দেয়াড়া বিহারি কলোনির সদস্যরাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এরা ১৯৭০এর নির্বাচনের আগে-পরেও গোটা এলাকায় মুসলিম লীগ নেতা খান এ সবুরের পক্ষে প্রচার-প্রচারণা চালিয়েছে এবং আওয়ামী লীগ কর্মী-সমর্থক এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

গণহত্যার পটভূমি

একাত্তরের মার্চ মাসের প্রথম থেকেই গোটা দেশের পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়, চূড়ান্ত লড়াই অনিবার্য। পাকিস্তান রক্ষার আন্দোলনে অবাঙালি বিহারিরা ছিল অনেক বেশি সক্রিয়। বাঙালিদের আন্দোলন দমনেও ওরা অনেক বেশি উৎসাহী ছিল। খুলনার খালিশপুরে ছিল বিপুল সংখ্যক বিহারির বাস। খালিশপুরের পাশ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর বয়ে গেছে ভৈরব নদী। নদীর অপর পাড়ে দিঘলিয়ায়ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বিহারিরা বাস করতো। সাধের পাকিস্তান রক্ষায় অবাঙালিরা বাঙালিদের ওপর আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।

২৫ মার্চের কালো রাতের দিনে খালিশপুরেও অবাঙালিরা বাঙালিদের ওপর আক্রমণ করে। নির্বিচারে হত্যা করে বাঙালিদের, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ করে। মৃতদের লাশ ফেলে দেয় ভৈরবে। অবশ্য ২৬ ও ২৭ মার্চ বাঙালিরা তাদের প্রতিরোধ করে। দুই পক্ষেই সংঘর্ষ হয়। অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়। নদীর ওপারে দিঘলিয়ায়ও এ খবর পৌঁছায়। পাকিস্তানপ্রেমী বাঙালি

ও বিহারিরা মিলে দেয়াড়া ও গোয়ালপাড়ার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বাড়িতে বিচ্ছিন্নভাবে হামলা করতে শুরু করে। তাদের মধ্যে আতঙ্ক বাসা বাঁধে। বলা হতো, সনাতন ধর্মাবলম্বী তথা হিন্দু মানে ভারতের চর; হিন্দুরা পাকিস্তানকে চায় না। প্রচারণা ছিল, পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনও করছে হিন্দুরা। ফলে আক্রমণের লক্ষ্য হয় নিরীহ সাধারণ হিন্দু জনগোষ্ঠী।

২৭ মার্চ রাতে মহাদেব চক্রবর্তীসহ খুলনা শহরের সাত জন (মতান্তরে ছয় জন) প্রভাবশালী, ধনী হিন্দু সদস্যকে হত্যা করা হয়। কথিত আছে, মহাদেব চক্রবর্তীর সাথে মুসলিম লীগ নেতা খান এ সবুরের বিশেষ সখ্য ছিল। কিন্তু ২৮ মার্চ ভোরবেলায় খুলনা শহরের হাজী মুহসীন রোড ও সাউথ সেন্ট্রাল রোডের সংযোগ স্থলের কাছে তাঁকেসহ ছয় জনের মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়। প্রচারিত হয়, রাতের আঁধারে বাড়ি থেকে তাঁদের তুলে এনে ওই জায়গায় হত্যা করে ফেলে রাখা হয়। প্রায় একই সময়ে চন্দনীমহল, খালিশপুর, দৌলতপুর প্রভৃতি হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলেও অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার পর থেকে খুলনা শহরে বসবাসকারী সনাতন ধর্মের অনুসারী মানুষেরা শহর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেন।

গোটা এপ্রিল মাসটি ছিল ভয়ঙ্কর। প্রথমে একটু দেখেশুনে, বাছ-বিছার করে আক্রমণ করা হতো। পরে তা নির্বিচারে শুরু হয়। লুটপাটও প্রথমে ছিল একটু দেখেশুনে, চোখ লজ্জা এড়িয়ে। পরে তা যেন প্রকাশ্যে এবং আক্রমণ-লুটপাট করাটাই একটি বিশেষ কাজ হিসেবে দেখা দেয়। প্রতিবেশী, স্বজন, সনাতন ধর্মের মানুষটির সম্পদ লুট করা, তার বাড়িঘরে আগুন লাগানো, তাঁকে ভিটে ছাড়া করা যেন এক শ্রেণির মানুষের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। আর এই আক্রমণের মুখে মানুষ ঘর-বাড়ি সহায়-সম্পদ ফেলে পালাতে শুরু করেন।

এই অবস্থার মধ্যে ১২ এপ্রিল খুলনা রেডিও স্টেশন থেকে মুসলিম লীগ নেতা খান এ সবুরের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এক বক্তৃতা প্রচারিত হয়। ওই বক্তৃতায় তিনি শান্তি কমিটি গঠনের আহ্বান জানান। শুরু হয় শান্তি কমিটি গঠনের কাজ। খুলনা শহর ও আশেপাশে থানা-উপজেলায়ও শান্তি কমিটি গঠিত হয়। দিঘলিয়ায়ও শান্তি কমিটি গঠিত হয়। এই শান্তি কমিটির অন্যতম প্রভাবশালী নেতা ছিল সেনহাটি মিয়াপাড়ার সৈয়দ আলী আহমেদ, গোয়ালপাড়া গ্রামের রাঙা মিয়া, ব্রহ্মগাতী গ্রামের আব্দুল গফুর, আবু বক্কর ও আবু জাফর এবং সুগন্ধি গ্রামের মুন্সি হাবিবুর রহমান। শান্তি কমিটির সদস্যদের নেতৃত্বে শুরু হয় দমন-পীড়ন, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি।

আশেপাশেও ঘটে চলে ভয়ঙ্কর সব ঘটনা। পয়লা বৈশাখের দিন ১৪ এপ্রিল ডুমুরিয়ার রঙপুর ইউনিয়নের রঙপুর কালিবাটি গ্রামে আক্রমণ করে পাকিস্তানি সেনারা। তাদের সঙ্গে ছিল এদেশীয় সহযোগীরাও। সেখানে আক্রমণকারীরা প্রথমেই হত্যা করে বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষক প্রফুল্ল কুমার বিশ্বাসকে। নির্বিচারে আরও অনেককে সেদিন হত্যা করা হয়। এসব খবর যেমন আসে, তেমনি আসতে থাকে শরণার্থীরা। বাগেরহাটের বিভিন্ন গ্রাম থেকে নদীপথে নৌকাযোগে মানুষ তাঁদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে আসতে শুরু করে, উদ্দেশ্য সীমান্তের ওপারে যাওয়া। নৌ-পথে কাজীবাছা হয়ে বটিয়াঘাটার ফুলতলা দিয়ে খড়িয়া নদী দিয়ে বেরিয়ে ভদ্রা, ঘ্যাংরাইল, শালতা নদী দিয়ে চুকনগর, ঝাউডাঙ্গা হয়ে একেবারে ইছামতির ওপারে– ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছানোর নির্ভরযোগ্য নৌ-পথ হয়ে ওঠে।

খান এ সবুর অনুসারীদের নেতৃত্বে শান্তি কমিটি গঠিত হওয়ার পর হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের বাড়িতে আক্রমণ ও লুটপাটের ঘটনা জোরদার হয়। আবার, সবুর অনুসারীরা পাকিস্তানি সেনাদের সহযোগী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক শক্তি, সমর্থক এবং সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন-লুটতরাজ-অগ্নিসংযোগ-গণহত্যা চালায়। খুলনায় সমর্থক সংখ্যায় কম হলেও জামায়াতে ইসলামী একাত্তরে বেশ সংগঠিত ছিল। জামায়াতে ইসলামী নেতা মাওলানা এ কে ইউসুফের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একাত্তরের ২০ মে খুলনার আনসার ক্যাম্পে (ভুতের বাড়ি) আনুষ্ঠানিকভাবে রাজাকার বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। এরপর থেকে এই অঞ্চলে রাজাকার বাহিনী সকল ধরনের অত্যাচার-নির্যাতন-লুটপাট-অগ্নিসংযোগ-হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয়।

দিঘলিয়ার গোয়ালপাড়া গ্রামের রাঙা মিয়া এবং তার ছেলে শেখ শওকত হোসেন রাজাকার হিসেবে নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করে। আগে থেকেই এরা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন চালাতে শুরু করে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিতাড়িত করে এরা একের পর এক জমি দখল করতে শুরু করে। শওকত ক্রমান্বয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। সে সহ আরও কতিপয় সঙ্গী রাজাকার গোটা দিঘলিয়া এলাকায় মূর্তিমান আতঙ্ক হিসেবে আবির্ভূত হয়। দখলবাজি, লুটপাটের পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বের করা এবং তাঁদের সহযোগীদের নিশ্চিহ্ন করা এদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

একাত্তরের জুন মাসের মধ্যেই মুসলিম লীগ অনুসারী এবং রাজাকার বাহিনী দিঘলিয়াসহ গোটা খুলনাঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। জুলাই মাসের দিক থেকে শুরু হয় সংগঠিত প্রতিরোধ।

ততোদিনে শুরু হয়ে গেছে মুক্তিযোদ্ধাদের কাল। মুক্তিযোদ্ধারা তখন পাল্টা আক্রমণ করতে শুরু করেছে। দিঘলিয়ার দেয়াড়া গ্রামের একাধিক পরিবারের সদস্য মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম লেখায়।

এই গ্রামের ডা: মতিয়ার রহমানের ছেলে শেখ আবদার রহমান ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি লুকিয়ে গ্রামে আসতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের আরও সংগঠিত করার লক্ষ্যে তিনি যুবকদের মধ্যে থেকে মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ করতেন এবং এলাকায় মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির ওপর আক্রমণ করতেন। এরকম অনেকগুলো সফল আক্রমণে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী মুসলিম লীগার এবং রাজাকাররা তটস্থ হয়ে ওঠে। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের জব্দ করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। এরই অংশ হিসেবে রাজাকার ও বিহারিদের সম্মিলিতদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি সেনা সদস্যরা ২৭ আগস্ট দেয়াড়ায় আক্রমণ করে। আক্রমণকারীরা ডা: মতিয়ার রহমান ও ওই পরিবারের সদস্য-স্বজন, প্রতিবেশী, মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক গোষ্ঠীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্বিচারে হত্যা করে।

গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ

১৯৭১-এর আগস্ট মাস। গোটা দেশে মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ যুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের হটিয়ে দিতে শুরু করেছে। দেশীয় দালাল রাজাকার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে ফিরছে। ২৭ আগস্ট ভোরবেলা। সবে দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। এমনি সময় দেয়াড়া গ্রামে রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা পাকিস্তানি সেনাদের নিয়ে হামলে পড়ে।

পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগী রাজাকাররা পিপলস্ জুটমিলের খেয়াঘাট পার হয়ে এপারে আসে। সেনহাটি গ্রাম হয়ে তারা দেয়াড়ায় এসে পৌঁছায়। ভোর রাতেই কয়েক'শ রাজাকার, বিহারি ও পাকিস্তানি সেনা-সদস্যরা গোটা দেয়াড়া গ্রামটি ঘিরে ফেলে। তারা মুক্তিযোদ্ধা আবদারের নাম ধরে খুঁজতে থাকে। সে কোথায় আছে, জানতে চায়। তাঁকে বের করে দিতে বলে। কিন্তু কোথাও মুক্তিযোদ্ধা আবদারকে খুঁজে পায় না। এতে ক্ষুব্ধ-হতাশ আক্রমণকারীরা প্রতিশোধের নেশায় মেতে ওঠে। ধরে ফেলে মুক্তিযোদ্ধা আবদারের পিতা ডা: মতিয়ার রহমান ও অন্যদের। শুরু করে এলোপাতাড়ি গুলি।

সে এক ভয়ানক অবস্থা। চিৎকার-চেঁচামেচি, মারধর, গুলি, ধারালো অস্ত্রের আঘাত, প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ছুটে পালানো সব মিলিয়ে এক অরাজক আতঙ্কজনক পরিস্থিতি। এরই মাঝে

আক্রমণকারীরা ডা: মতিয়ার রহমানের বাড়ি থেকে ছয় জনকে ধরে ফেলে। রাস্তায় এনে তাদেরকে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে ডাঃ মতিয়ার রহমান, তার চাচাতো ভাই পিরু ও আলী, ভাগ্নে ছোট খোকা, জামাই আব্দুল জলিল ও তার সহোদর আব্দুল বারিককে এনে দাঁড় করায়। সেখানেই তাঁদেরকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করে।

আক্রমণকারীরা আরও কিছু মানুষকে ধরে এক জায়গায় জড়ো করে। তারা ধরে নেওয়া মানুষগুলোকে ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করতে শুরু করে। তারা বয়স্ক এবং যুবকদের ধরছিল বলে গ্রামের যুবক ও বয়স্ক মানুষগুলো যে যেদিকে পারে পালিয়ে যেতে থাকে। গোটা গ্রামে তখন ভয়ার্ত মানুষের আর্তনাদ, চিৎকার, গুলির শব্দ, আক্রমণকারীদের উল্লাস ধ্বনিতে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়।

আক্রমণের মুখে কেউ কেউ পালাতে সক্ষম হলেও তাদের হাতে মোট ৬১ জন যুবক-বয়স্ক মানুষ ধরা পড়েন। যারা পালানোর চেষ্টা করছিল, তাদেরকে মুরগি ধরার মতো করে ওরা পিছন পিছন ছুটে আসছিল। আর ধরে ফেলে শিকার বধ করার মতো মাটিতে ফেলে বিহারি রাজাকারগুলো ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করে কুপিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। আর পাকিস্তানি সেনারা গুলি করেছে, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছে।

পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের হাতে ধৃত ৬১ জনের মধ্যে ৬০ জন ঘটনাস্থলেই শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। এঁদের মধ্যে ৩৮ জনের লাশ ওই পাষণ্ড রাজাকারের দল ভৈরব নদীতে ছুঁড়ে ফেলে। বাকি ২২ জনকে তিনটি গণকবরে মাটিচাপা দেয়। বাকি একজন সারা শরীরে ধারালো অস্ত্রের ১৯টি আঘাত সয়েও বেঁচে যান। আজও তিনি সেই ভয়ঙ্কর দিনকে স্মরণ করে শিউরে উঠেন।

শরীরে ধারালো অস্ত্রেও ১৯টি ক্ষত-যন্ত্রণা নিয়ে আজও বেঁচে আছেন সৈয়দ আবুল বাশার। রাজাকাররা তাঁকেও হত্যা করার উদ্দেশ্যে অন্যদের সঙ্গে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়েছিল, কিন্তু গুলি তার শরীরে লাগেনি। তিনি মাটিতে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ করেই ঘাতকদের চোখে পড়ে তাঁর শরীর থেকে কোনো রক্ত বেরোয়নি। তাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন বলে ওঠে, 'বাশারের শরীর থেকে রক্ত বেরোয়নি।' একথা শুনেই উৎসাহী এক ঘাতক ধারালো অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসে, আর শুরু করে এলোপাতাড়ি আঘাত। একনাগাড়ে কুপিয়ে তাঁকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে যায়।

সৈয়দ আবুল বাশারের ছেলে সেই সময়ের কিশোর হিরু লাশটি উদ্ধার করে। কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পারেন, না, তাঁর পিতা মারা যাননি, বেঁচে আছেন। সারাদিন রাজাকারদের দৃষ্টি এড়িয়ে গুরুতর আহত পিতাকে তারা লুকিয়ে রাখেন। সন্ধ্যার পর এক সহৃদয়বান ব্যক্তির সহায়তায় তাঁকে খুলনা সদর হাসপাতালে নেয়া হয়। খুলনা শহর তখন পাকিস্তানি সেনাদের দখলে। চারদিকে বিপদ। তাদের বহনকারী গাড়ির চালক হিরুকে শিখিয়ে দেন, কেউ জানতে চাইলে যেন বলে তার পিতাকে রাজাকাররা নয়, ডাকাতরা কুপিয়েছে। হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্তরা কিভাবে আহত হয়েছে জানতে চাইলে হিরু সেই শেখানো কথাই বলে যে, তার পিতাকে ডাকাতরা কুপিয়েছে। সেখানে তিনি এক মাসেরও বেশি সময় চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হন। সুস্থ হয়ে বাড়িতে আনার পরও তাকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হতো। কারণ, মানুষটিকে নিয়ে রাজাকারদের মধ্যে ঔৎসুক্য ছিল। বেঁচে যাওয়ার খবর রাজাকাররা নিশ্চিত হলে আবারও আক্রমণের আশঙ্কা ছিল।

মুক্তিযোদ্ধা আবদার রহমানকে ধরতে না পেরে তাদের নির্মমতার শিকার হয় তার পরিবারের সদস্য, স্বজন, সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক। ওইদিনের বর্ণনা দিয়ে আফজাল হোসেন বলেন, 'আমরা সবে সকালে ঘুম থেকে উঠেছি। এমন সময় দেখি গ্রামে অস্ত্রধারী রাজাকার, বিহারি ও খানসেনাদের দল। আমাদের বাড়িটি তারা ঘিরে ফেলে নির্বিচারে গুলি করতে শুরু করে। বাবা আমাকে বলেন, যেখানে পারিস পালা। আমি দৌড়ে একটি ঝোঁপের মধ্যে লুকাই। সকলে যেখানেই পারছে ছুটে পালাচ্ছে। সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। দৌড়াদৌড়ি। গুলি। আর্তচিৎকার। আতঙ্ক। ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতি। সকলে পালাতে পারেনি। যারা পালাতে পারেনি, তাদেরকে রাজাকার, খান সেনারা ধরে নিয়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে গেছে। এবং গুলি করে, ধারালো অস্ত্রের আঘাত করে তাদেরকে হত্যা করেছে।'

রাজাকাররা সেদিন ২২ জনকে দেয়াড়া গ্রামের তিনটি পৃথক স্থানে গণকবর দেয়। স্বাধীনতা পরবর্তী ৩৮ বছর পর ২০১০-এর প্রথমদিকে একটি কারখানা গড়ে তোলার সময় এই কবরটি চিহ্নিত হয়। সেই গণকবরটি পরবর্তীকালে একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

গণহত্যা-নির্যাতনকারীদের পরিচয়

পাকিস্তানি সেনাদের সাথে বিহারি (অবাঙালি) এবং স্থানীয় রাজাকারদের মধ্যে গোয়ালপাড়া গ্রামের শেখ শওকত হোসেন ও ব্রহ্মগাতি গ্রামের শেখ জাফর ঘটনাস্থলেই ছিল। এছাড়াও এদের সহযোগী ছিল ব্রহ্মগাতি গ্রামের গণি, আবু বকর ও শেখ আব্দুল গফুর। পাকিস্তানি সেনা এবং সহযোগী অবাঙালিদের কেউই চিনতে পারেনি। তবে চিনতে পেরেছিল শওকত হোসেন ও শেখ জাফরকে।

শওকত হোসেন

মুসলিম লীগ নেতা খান এ সবুরের একান্ত আস্থাভাজন অনুসারী ছিলেন শওকত হোসেন। মূলত এর পিতা রাঙা মিয়া ছিল মুসলিম লীগের স্থানীয় নেতা। পিতার ছায়াসঙ্গী হিসেবে তখনকার সময়ে তরুণ শওকত বেপরোয়া হয়ে ওঠে। লুটপাট-অগ্নিসংযোগ ও নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডে সিদ্ধহস্ত হয়। তাদের গ্রামেই ছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়ের বসতি। এদের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যস্থল ছিল হিন্দুপাড়া ও তাদের সম্পত্তি। অনেকের সম্পত্তি তারা জবর দখল করে। একাজটি সহজতর করার জন্যে হিন্দু পরিবারের নারী সদস্যদের ওপর তারা অত্যাচার করতো। একটি পরিবারের একজন তরুণীকে শওকতের ভাই কওসার তুলে নিয়ে জোর করে বিয়ে করে, আর ওই পরিবারের সকল সম্পত্তি দখলে নেয়। বিয়ে করলেও ওই নারীকে সে নিয়মিত অত্যাচার করতো। এক পর্যায়ে তিনি মারা যান। মারা যাওয়ার ঘটনাটি নিয়েও নানা কথা আছে। শোনা যায়, কওসারের অত্যাচারেই ওই নারীর মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে ওই নারীর ছোট বোনকে এদের ছোট ভাই হাসান তুলে নিয়ে বিয়ে করে।

দেয়াড়া গণহত্যায় শওকত হোসেন প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবদার যে মামলা দায়ের করেন সেই মামলার আসামী ছিল শওকত হোসেন। দেশ স্বাধীনের পরপরই শওকত গা-ঢাকা দেয়। এলাকায় ফিরে আসে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর। জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির সাথে সে যুক্ত হয়। ১৯৭২ সালের মামলার সূত্র ধরে ২০০৯ সালে দায়ের করা মামলায় এই শওকত হোসেন আসামী। উচ্চ আদালত থেকে জামিন নিয়ে শওকত এলাকাতেই আছে।

আবু জাফর

ব্রহ্মগাতি গ্রামের শেখ আব্দুল গফুরের ছেলে আবু জাফর। গফুর ছিল মুসলিম লীগ রাজনীতির সাথে যুক্ত। খান এ সবুরের ভক্ত। পিতার সঙ্গী হয়ে পুত্র আবু জাফরও একাত্তরে এলাকায় নিপীড়নকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়। দেয়াড়া গণহত্যায় সে সরাসরি অংশ নিয়েছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। ১৯৭২ সালে মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবদার রহমানের দায়ের করা মামলায় আবু জাফরও একজন আসামী ছিল। দেশ স্বাধীনের পর আবু জাফর এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর সে আবারও এলাকায় ফিরে আসে। পরবর্তীতে সে জাতীয় পার্টির রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়। ১৯৭২-এর মামলার সূত্র ধরে ২০০৯ সালে দায়ের করা মামলায়ও এই জাফর আসামী। উচ্চ আদালত থেকে জামিন নিয়ে জাফর এলাকাতেই আছে।

২৭ আগস্টে আক্রমণকারীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবদার হোসেন। আক্রমণকারীরা প্রথমেই তাঁদের বাড়িটি ঘিরে ফেলে। তাঁকে না পেয়ে তাঁর পিতা দেয়াড়া গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা চিকিৎসক ডা: মতিয়ার রহমান এবং তাঁর পরিবারের মোট ৬ জনকে ওরা হত্যা করে। মতিয়ার রহমানের স্বজন ৫ জন শহীদ হচ্ছেন : ভাগ্নে ব্যবসায়ী শেখ ইসমাইল হোসেন ওরফে ছোট খোকা, জামাইয়ের বড় ভাই ব্যবসায়ী আব্দুল বারেক, জামাতা শিক্ষক আ: জলিল, চাচাতো ভাই ব্যবসায়ী শেখ রহমত আলী পিরু এবং আরেক চাচাতো ভাই পিরুর সহোদর শেখ মোশারফ আলী।

এছাড়াও গণহত্যার শিকার হন গোডাউন শ্রমিক হোসেন সরদার, অবাঙালি আজিম হোসেন (হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করায় তাকে হত্যা করা হয়), গোডাউন শ্রমিক ছত্তার শেখ, পরামানিক (এই নাম জানা গেলেও তার কোনো উত্তরসূরী বা স্বজনের খোঁজ পাওয়া যায়নি), গোডাউন শ্রমিক জয়নাল হাওলাদার, ওয়াহেদ চৌকিদার, গোডাউন শ্রমিক মোকছেদ মীর এবং তাঁর ছেলে মোসলেম মীর।

ওইদিন পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের পৈশাচিকতার শিকারদের একটি বিরাট অংশের স্থায়ী আবাস দেয়াড়ায় ছিল না। যে কারণে পরবর্তীকালে অনেক অনুসন্ধান করেও সকল শহীদ পরিবারের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

শহীদ শনাক্তকরণ ও পরিচয়

ক্রম	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
০১	মতিয়ার রহমান	মোজাম শেখ	দেয়াড়া	দিঘলিয়া
০২	শেখ ইসমাইল হোসেন ওরফে ছোট খোকা	ইউসুফ শেখ	ঐ	ঐ
০৩	আব্দুল বারেক	হেলালউদ্দিন শেখ	ঐ	ঐ
০৪	আ: জলিল	হেলালউদ্দীন শেখ	ঐ	ঐ
০৫	শেখ রহমত আলী পিরু	শরিয়াতুল্লাহ শেখ	ঐ	ঐ
০৬	শেখ মোশারফ আলী	শরিয়াতুল্লাহ শেখ	ঐ	ঐ
০৭	হোসেন সরদার	-	ঐ	ঐ
০৮	আজিম হোসেন	-	ঐ	ঐ
০৯	ছাত্তার শেখ	-	ঐ	ঐ
১০	জয়নাল হাওলাদার	-	ঐ	ঐ
১১	ওয়াহেদ চৌকিদার	-	ঐ	ঐ
১২	মোকছেদ মীর	-	ঐ	ঐ
১৩	মোসলেম মীর	মোকছেদ মীর	ঐ	ঐ
১৪	পরামানিক	-	ঐ	ঐ

(অসম্পূর্ণ)

ভুক্তভোগী ও নির্যাতিতদের তালিকা

সেই ভয়াল দিনটির স্মৃতি আঁকড়ে আজও বেঁচে আছেন শহীদ ও নির্যাতনের শিকার পরিবারের সদস্যরা। ডা: মতিয়ার রহমানের ছেলে আফজাল হোসেন আজও এই রাজাকার-যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার। বুকের মধ্যে একরাশ যন্ত্রণা নিয়ে তিনি আজও রাজাকার-লুটতরাজকারী-সম্পদ লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের কাজ করে চলেছেন। শেখ ইসমাইল হোসেন ওরফে ছোট খোকার স্ত্রী রোকেয়া বেগম আজও নীরবে অশ্রু ফেলে চলেছেন। আব্দুল বারেকের ছেলে নজরুল ইসলাম প্রকাশ্যে কিছু বলতে না চাইলেও আশা করেন যে, তাঁর

পিতার হত্যাকারীরা সাজা পাক। আ: জলিল, শেখ রহমত আলী পিরু, শেখ মোশারফ আলী, হোসেন সরদার, আজিম হোসেন, ছত্তার শেখ, জয়নাল হাওলাদার, ওয়াহেদ চৌকিদার, আ: বারেক ব্যাপারী এবং মোকছেদ মীরের পরিবারের সদস্যরা স্বজন হারানো বেদনা নিয়ে আজও নীরবে চোখের পানি ফেলেন।

ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়া গোডাউন শ্রমিক সৈয়দ আবুল বাশার আজও বেঁচে আছেন। ওই সময় তাঁকে উদ্ধারকারী তাঁর ছেলে হিরুও বেঁচে আছেন। আবুল বাশার এখনও সেদিনের যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে চলেছেন। তাঁর ছেলে হিরুও সেদিনে দুঃসহ স্মৃতি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি খুলনা শাখার উদ্যোগে ২০১১-এর ২৭ আগস্ট খুলনা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত এক স্মরণানুষ্ঠানে শহীদদের স্বজন ও নির্যাতিতদের সম্মাননা জানায়। সংবর্ধিতরা হলেন দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে আজও বেঁচে থাকা আবুল বাশার ও তাঁর ছেলে হিরু, ডা: মতিয়ার রহমানের ছেলে মো: আফজাল হোসেন; শেখ ইসমাইল হোসেন ওরফে ছোট খোকার স্ত্রী রোকেয়া বেগম; আব্দুল বারেকের ছেলে নজরুল ইসলাম; আ: জলিলের শ্যালক শেখ আসাদুজ্জামান; শেখ রহমত আলী পিরুর ছেলে মো: সেলিম; শেখ মোশারফ আলীর ভাইপো মো: জাহিদুল ইসলাম মিঠু; হোসেন সরদারের ছেলে গোলাম মোস্তফা; আজিম হোসেনের স্ত্রী বিদেশী বেগম; ছত্তার শেখের শ্যালিকা আম্বিয়া বেগম; জয়নাল হাওলাদারের বোন মঞ্জিলা খাতুন; ওয়াহেদ চৌকিদারের ভাগ্নে আ: বারেক ব্যাপারী এবং মোকছেদ মীরের ছেলে কালু মীর।

তবে ওইদিনের ভুক্তভোগী ও নির্যাতিতদের বেশির ভাগ সদস্যই মুখ খুলতে চান না। বেদনায় তাঁদের কণ্ঠ বুজে আসে। কেউ কেউ খুবই ক্ষুব্ধ। ২৭ আগস্ট গণহত্যার অন্যতম সদস্য শওকত আজও বেঁচে আছে। বেশ বহাল তবিয়তে আছেন। মুক্তিযুদ্ধকালের ওই দিনটির গণহত্যার ঘটনায় ১৯৭২ সালে দৌলতপুর থানায় একটি মামলা দায়ের হয়। তাতে আসামী হিসেবে ওই শওকতসহ ২১ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। এদের মধ্যে ১৯ জনই মারা গেছে। এখনও শওকত এবং জাফর বেঁচে আছে। এই দু'জনকে আসামী করে ২০০৯ সালে আরও একটি মামলা দায়ের হয়। কী আশ্চর্য, উচ্চ আদালত থেকে জামিন নিয়ে তারা এখনও দিব্যি আছে, এখনও তারা প্রভাবশালী; বেপরোয়া।

প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য

মো: জিন্নাত হোসেন (৬৮)

মো: জিন্নাত হোসেন

পিতা: আব্দুল সামাদ শেখ, গ্রাম: দেয়াড়া, দিঘলিয়া, খুলনা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ২০ অক্টোবর, ২০১৪

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে আমাদের এলাকার মুসলিম লীগের অনুসারীরা বেশ নড়ে চড়ে বসে। আমরা ভৈরব নদীর পূর্ব পাড়ের বাসিন্দা। আর পশ্চিম পাড়ে জুটপ্রেস ও জুটমিলের সারি। আমাদের পাড়ে ছিল (এখনও কিছু কিছু আছে) পাটের গুদাম। এই জুটপ্রেস, জুটমিল ও পাট গুদাম রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ভিন জেলার অনেক মানুষও এখানে আসে। তাদের মধ্যে বিহারিরাও ছিল। এই বিহারিদের একটি অংশ আমাদের দেয়াড়া গ্রামের একাংশে বসবাস করতো। জায়গাটিকে বিহারি কলোনী বলা হয়।

কামরুল হাসান
বাংলাদেশ ১৯৭১
তেলরং

একাত্তরে আমার বয়স ছিল ২৪। আমিও খালিশপুরের পিপলস জুটমিলে কাজ করতাম। ২৫, ২৬ ও ২৭ মার্চ খালিশপুরে বিহারি ও বাঙালিদের মধ্যে দাঙ্গা হয়। দাঙ্গাটি শুরু করে বিহারিরা। তারা বেপরোয়াভাবে বাঙালিদের হত্যা করতে শুরু করে। লুটতরাজ করে। বাড়ি-ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। মৃত মানুষের দেহগুলো মিলগুলোর বয়লারে চুড়ে ফেলা হয়, ভৈরব নদীতে ছুঁড়ে ফেলা হয়। নদীতে ভেসে যাওয়া এসব লাশ ফুলে উঠে ভয়ঙ্কর চেহারা নিতো। এসব দেখে-শুনে আমরা ভয়ে কুঁকড়ে থাকতাম। আমি মিলে যাওয়া বন্ধ করে দিই।

অবশ্য, এসব ঘটনায় বিহারিরা বেশ আনন্দিত ও উৎসাহিত ছিল। আমাদের গ্রামের বিহারি কলোনীর বাসিন্দারাও লুটপাটে

অংশ নেয়। আর খান এ সবুরের মুসলিম লীগ অনুসারীরাও ছিল। বিশেষ করে আমাদের দিঘলিয়ার পাশের গ্রাম গোয়ালপাড়ার মুসলীম লীগার রাঙা মিয়া শুরু থেকেই লুটপাট ও দখলবাজিতে নেমে পড়ে। গোয়ালপাড়ায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যরা বাস করতো। ভুয়া দলিল করে ওইসব হিন্দুদের জমি দখলও করেছে রাঙা মিয়া আর তার ছেলে শেখ শওকত হোসেন। দিনে দিনে এই শওকত হোসেন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। গোয়ালপাড়ার একটি সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের এক নারীকে জোর করে বিয়ে করে। তার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালাতো। এক পর্যায়ে তার ওই স্ত্রী মারা যায়। এরপর ওই স্ত্রীর আর এক বোনকে ধরে এনে নিজের ভাইয়ের সাথে বিয়ে দেয়।

শওকত রাজাকার হিসেবে নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করে। এলাকায় লুটপাট, দখলবাজি এবং মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তাকারীদের নিশ্চিহ্ন করতে শওকত ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা রাতদিন চেষ্টা করেছে। মুক্তিযুদ্ধকালে আমাদের এলাকায় নকশালপন্থীদেরও একটি প্রভাব ছিল। তাদের ভূমিকাটি কি ছিল তা পরিষ্কার নয়, তবে নকশালপন্থীদের অনেক নিকট জন রাজাকার হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে।

এই রাজাকার শওকত ও তার ভাই জাফরসহ বিহারি কলোনীর বেশ কয়েকজন এবং পাকিস্তানি সেনারা ২৭ আগস্ট আমাদের গ্রামে চড়াও হয়। জানতে পারি, তারা পিপলস জুটমিলের মধ্যে দিয়ে যে খেয়াঘাট তা প্যার হয়ে এপারে আসে। এপারে সেনহাটি হয়ে তারা দেয়াড়ায় এসে পৌঁছায়। তখনও দিনের আলো পরিষ্কার হয়নি। আমি তখন ঘরে শুয়ে ছিলাম। কথাবার্তা, চিৎকার, হুড়োহুড়িতে আমি উঠে পড়ি। বাইরে এসে হাবিবুর রহমানের বাড়ির সামনে অনেক লোক দেখতে পাই। তাদের মধ্যে রাজাকার এবং পাকিস্তানী সেনারাও ছিল। রাজাকাররা ওই বাড়ির কাছ থেকে হোসেন সরদার, জয়নাল, পিরু, আলী (পিরু ও আলী দুই ভাই), মাহবুব ও দিবারুলকে নিয়ে আসে। পথিমধ্যে হাবিবুর রহমান রাজাকারদের সাথে কথাবার্তা বলে মাহবুব ও দিবারুলকে ছাড়িয়ে রাখে।

এক পর্যায়ে রাজাকাররা এলোপাতাড়ি গুলি করতে শুরু করে এবং ধরে নেওয়া মানুষগুলোকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আঘাত করতে শুরু করে। তারা বয়স্ক এবং যুবকদের ধরছিল বলে গ্রামের যুবক ও বয়স্ক মানুষগুলো যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। আমিও বিপদের গন্ধ পেয়ে দৌড়ে নদীর পাড়ে এসে একটি ঝোঁপের আড়ালে লুকাই। ততক্ষণে গোটা গ্রামে

ভয়ার্ত মানুষের আর্তনাদ, চিৎকার, গুলির শব্দ, আক্রমণকারীদের উল্লাস ধ্বনিতে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়। নদীর ঘাটে কোন নৌকা না পেয়ে সাঁতরে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করি। নদীর মাঝ বরাবর এসে একটি নৌকায় উঠে আমি এপারে আসি। এপারে দৌলতপুর মুহসীন স্কুলের কাছে আমার এক বোনের বাসায় এসে আমি আমার ভিজে কাপড় পাল্টাই।

কিছু পরে আমি আবারও নদীর পাড়ে আসি। লক্ষ্য রাখছিলাম ওপাড় (দেয়াড়ার পার) থেকে কোন নৌকা আসে কি-না, আর সেখানকার খোঁজ-খবর পাওয়া যায় কি-না। বিকেলের দিকে আমি আবারও এপাড়ে আসি। তখন রাজাকারের দল ও পাকিস্তানি সেনারা চলে গিয়েছিল। এলাকাবাসীর কাছে শুনি তারা অসংখ্য মানুষকে মেরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে; অনেককে মাটিচাপা দিয়েছে। তারা পাকিস্তানি সমর্থক, ইসলাম রক্ষক অথচ হত্যা করেছে উল্লাস করে এবং লাশের প্রতিও করুণা করেনি। পরে আমরা হিসাব করে দেখি তারা ৬১ জনকে মেরেছে, তবে সকলের নাম-ঠিকানা জোগাড় করা যায়নি। এই ৬১ জনের মধ্যে একজন– বাশার মিয়া তিনি আবারও আমাদের মাঝে জীবন নিয়ে ফিরে আসেন।

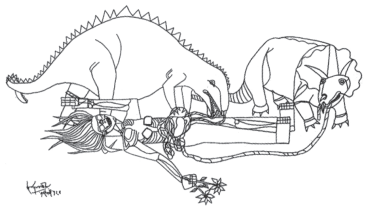

মুর্তজা বশীর
বাংলাদেশ ১৯৭১
কালি ও কলম, ১৯৭২

সৈয়দ আবুল বাশার (৮৪)

পিতা: সৈয়দ মকিম আলী, গ্রাম: দেয়াড়া, দিঘলিয়া, খুলনা, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ : নিজ বাসভবন, ২০ অক্টোবর ২০১৪

আমি সৈয়দ আবুল বাশার। আমি দিঘলিয়ার একটি পাট গুদামের পাহারাদার হিসেবে কাজ করতাম। আমার বয়স তখন চল্লিশের কম-বেশি হবে। একাত্তরে আমি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিইনি। তবে এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আমার যোগাযোগ ছিল।

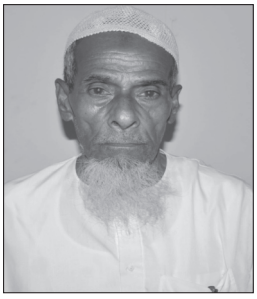

সৈয়দ আবুল বাশার

দেয়াড়া, দিঘলিযা জুড়ে ছিল মুসলিম লীগ ও রাজাকারদের দাপট। আর ছিল নকশাল। এরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, না রাজাকারদের পক্ষে ছিল, তা আমরা বুঝতে পারতাম না। দেয়াড়ায় আরও ছিল বিহারিরা। এরা শুরু থেকেই লুটপাট, হামলা, মারামারিতে অংশ নিতে থাকে। তাদের দাপটও ছিল বেশ।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার বেশ পরে মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠিত হয়। দেয়াড়ার ডা: মতিয়ার রহমানের জেষ্ঠ্য পুত্র শেখ আবদার রহমান মুক্তিযোদ্ধার খাতায় নাম লেখায়। সে মাঝে মধ্যেই এলাকায় আসতো। বাড়ির সাথে যোগাযোগ রাখতো। এখানকার রাজাকার ও বিহারিদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতো। আমরাও তাঁকে সহযোগিতা করতাম।

ঘটনার দিন ২৭ আগস্ট তাঁকে ধরার উদ্দেশ্যেই রাজাকার-খান সেনারা এই গ্রামে হামলা করে। ওইদিন ভোর রাতে কয়েক'শ রাজাকার, বিহারি ও পাকি সেনারা গোটা দেয়াড়া গ্রামটি ঘিরে ফেলে। আবদারের নাম ধরে খুঁজতে থাকে। সে কোথায় আছে, জানতে চায়, তাকে বের করে দিতে বলে। সে এক ভয়ানক অবস্থা। চিৎকার-চেচামেচি, মারধর, গুলি, ধারালো অস্ত্রের আঘাত, প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ছুটে পালানো সব মিলিয়ে এক অরাজক আতঙ্কজনক পরিস্থিতি। এরই মাঝে আক্রমণকরীরা ডা; মতিয়ার রহমানের বাড়ি থেকে ছয় জনকে ধরে ফেলে। রাস্তায় এনে তাদেরকে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে ডাঃ মতিয়ার রহমান, তার চাচাতো ভাই পিরু ও আলী, ভাগ্নে ছোট খোকা, জামাই আব্দুল জলিল ও তার সহোদর আব্দুল বারিককে এনে দাঁড় করায়। সেখানেই তাঁদেরকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করে।

বিহারি রাজাকারগুলো ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করে মানুষকে কুপিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। পাকিস্তানি সেনারা গুলি করেছে, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মানুষ মেরেছে। খুনিদের কি উল্লাস, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আমি হত-বিহ্বল হয়ে রাস্তার পাশে একটি আড়ালে ছিলাম। ভেবেছিলাম আমাকে কেউ কিছু বলবে না। এমন সময় তাদের হাতে ধরা পড়া একজন দৌড়ে পালায় আসে। সে আমাকে রাস্তায় দেখেই জড়িয়ে বলে, 'বাশার ভাই, আমাকে বাঁচাও। ওরা আমাকে মেরে ফেলল।' মুরগি ধরার মত করে পিছন পিছন ওরা ছুটে আসে। আমাকে জড়িয়ে ধরা মানুষটিকে টেনে নিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে কোপাতে শুরু করে। প্রথমে আমার দিকে ওরা লক্ষ্য করেনি। কে যেন বলে ওঠে, 'এটিও মুক্তি হায়।' ওমনি একজন আমাকে কোপাতে শুরু করে। আমি মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে যাই। তারা ফিরে যায়। আমি ওই ভাবে মরার মত ভান করে পড়েছিলাম।

ওরা ফিরে যেতে থাকে। কে যেন বলে ওঠে, 'এই বাশারের শরীর থেকে রক্ত বেরোয়নি।' তারা আবারও ফিরে আসে। একজন আমাকে এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করে। একটানা কতকগুলো কোপ দিয়ে ওরা চলে যায়। অদুরে আড়ালে দাঁড়িয়ে আমার ছেলে হিরু সবই দেখে। ওরা চলে গেলে আমি হিরুকে ইশারায় ডাকি। ও এবং আরও কয়েকজন আমাকে ধরাধরি করে ঘরের মধ্যে এনে লুকিয়ে রাখে। পরে হাসপাতালে নেয়। আমি প্রায় দুই মাস হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি আসি। বাড়িতে একটি ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে থাকতাম। ঘরেই খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য সকল কাজ করতাম। সকলেই জানতো আমি মরে গেছি। কিন্তু বেঁচে যাওয়ার এই খবরটিও হয়তো তারা পেয়েছিল অথবা অনুমান করতো। রাজাকাররা প্রায়ই আমাদের বাড়িতে এসে আমার খোঁজ করতো। কিন্তু পরিবারের সকলেই বলেছে, আমি আর বেঁচে নেই। দেশ স্বাধীন হলেই সকলেই জানতে পারে, আমি বেঁচে আছি। আমি তখন প্রকাশ্যে আসি।

সেদিনের স্মৃতি মনে এলে কুঁকড়ে উঠি, কথা বলতে পারি না। কিভাবে বেঁচে আছি, তা বুঝতেই পারি না। আমার তো বেঁচে থাকার কথা নয়, ঊনিশটি ধারালো অস্ত্রের আঘাত সয়েও কি কেউ বেঁচে থাকতে পারে!

সৈয়দ ওবায়দুল হক হিরু (৫৯)

পিতা: সৈয়দ আবুল বাশার, গ্রাম: দেয়াড়া, দিঘলিয়া, খুলনা। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ : নিজ বাসভবন, ২০ অক্টোবর ২০১৪

আমার নাম সৈয়দ ওবায়দুল হক হিরু। সৈয়দ আবুল বাশার আমার আব্বা। তাঁকে রাজাকাররা নির্মমভাবে কুপিয়ে আহত করে ফেলে রেখে যায়। ঘটনার দিন একটু দূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি সেই দৃশ্য দেখি। পরে আমি আমার আব্বাকে উদ্ধার করি এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।

ঘটনার দিন সকালে চিৎকার-চেঁচামেচিতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আব্বা রাস্তার দিকে আসে। আমি প্রায় তার পিছনে পিছনে আসি। হঠাৎ করে দেখি একটি লোক দৌড়াতে দৌড়াতে এসে আমার আব্বাকে এসে জড়িয়ে ধরে। বলতে থাকে 'বাশার ভাই, বাশার ভাই আমাকে তুমি বাঁচাও। রাজাকাররা আমাকে মেরে ফেলল।' আব্বা তাকে কি বলেছিল, ঠিক মনে নেই। এরমধ্যেই দুই জন লোক হাতে বড় দা নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে আসে। আব্বা আমায় বলে, 'হিরু সরে যা। দৌড় দে।' আমি দৌড়ে পিছনের একটি ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই।

ওই দুই জন আব্বার কাছ থেকে লোকটাকে টেনে নিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। আর তাকে কোপাতে কোপাতে থাকে। লোকটির কি চিৎকার! বাঁচার জন্যে কাকুতি-মিনতি। কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ওরা এক নাগাড়ে তাকে কোপাতে থাকে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল। রক্ত ওদের চোখে-মুখেও লাগে। ততক্ষণে সেখানে আরও অস্ত্রধারীরাও আসে। ওদের মধ্যে কে যেন আমার আব্বাকে দেখিয়ে বলে, 'ওই ব্যাটা মুক্তি আছে।'

সৈয়দ ওবায়দুল হক হিরু

এরপর আব্বাকেও ওই দা দিয়ে কোপ দেয়। আব্বা উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। ওরা ফিরে যাচ্ছিল। এসময়ে কে যেন বলে ওঠে, 'এই বাশারের শরীর থেকে রক্ত বেরোযনি।' ওই ব্যাটা যে আগে আব্বাকে কুপিয়েছিল, সেই আবার ফিরে এসে আব্বাকে এলোপাতাড়িভাবে কোপাতে থাকে। আব্বার সারা শরীর থেকে রক্ত বেরুতে থাকে। ওরা চলে যায়। আমি আব্বার কাছে যাই।

ПРАВДА

информация

ТАСС передают

Скрыть не удалось

Стали известны подлинные масштабы террора пакистанских властей в Восточной Бенгалии

ЛЕТО

ত্রিশ লক্ষ শহীদের খবর প্রথম দেয়
মস্কো থেকে প্রকাশিত পত্রিকা প্রাভদা

আব্বার জ্ঞান ছিল। আমাকে বলে, 'তুই আমারে বাড়ি নিয়ে চল।' আমি তো একাই তাকে তুলে নিয়ে যেতে পারি না। তখন কাকে যে ডেকেছিলাম মনে নেই। তাকে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে যাই। তার সারা শরীরের কাটা জায়গাগুলো গামছা, কাপড় দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে তাকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখি। এদিকে প্রচার হয়ে যায় বাশারও মরে গেছে।

কোথায় ডাক্তার পাওয়া যায়, আমরা তার খোঁজ-খবর করতে থাকি। কিন্তু কাউকে পাওয়া যায় না। আবার ভয়ও ছিল, বিহারিরা এলাকায় থাকে তো। তারা দু'-একবার খোঁজও করেছে। যদি তারা জানতে পারে, তাহলে আবার এসে আক্রমণ করার ভয়ও ছিল। এমন সময় ওপারে (দৌলতপুরের পাড়ে) মিলে কাজ করে এমন এক ব্যক্তি আমাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। তিনি সন্ধ্যার সময় আব্বাকে নদী পার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একটি গাড়ি জোগাড় করে দেন।

আমি আব্বাকে নিয়ে এপারে এসে গাড়িতে উঠি। ওই ড্রাইভার আমার কাছে জানতে চান, আব্বার এই অবস্থা হল কি করে? আমি বলি রাজাকাররা মেরেছে। তিনি তখন আমাকে বলেন, 'একথা বলা যাবে না। তুমি বলবে ডাকাতরা কুপিয়েছে।' পথে পথে খান সেনা। যে-কোনো জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে এসব জিজ্ঞেস করতে পারে এবং হাসপাতালে তো জানতে চাইবেই, সেখানেও ডাকাতের আক্রমণের কথা বলতে হবে বলে তিনি আমাকে সতর্ক করে দেন।

আব্বাকে নিয়ে খুলনা সদর হাসপাতালে পৌঁছি। পথে কেউ আমাদের কাছে কিছু জানতে চায়নি। হাসপাতালে জানতে চাওয়া হয়, কিভাবে আব্বার এই অবস্থা হল। আমি বলি, ডাকাতরা কুপিয়েছে। হাসপাতালে তাকে ভর্তি করে নেয়া হয়। এক মাসেরও বেশি সময় তিনি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হন। তারপর তাঁকে বাড়িতে আনা হয়। বাড়িতে এনেও তাঁকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়। কারণ তখনও রাজাকাররা ওৎ পেতে ছিল। তারা কয়েকবার এসে আব্বার খোঁজ-খবরও করেছে। জানতে চেয়েছে তিনি কোথায় আছেন? তারা হয় তো কিছু সন্দেহ করতো। একারণে তার খাওয়া-দাওয়া সব ঘরের মধ্যেই হতো। দেশ স্বাধীন হলে সকলে জানতে পারে আবুল বাশার এখনও বেঁচে আছে। রাজাকারদের হাতে গুরুতর আহত হয়েও সে বেঁচে আছে।

আফজাল হোসেন (৫২)

পিতা: মতিয়ার রহমান, গ্রাম: দেয়াড়া, দিঘলিয়া, খুলনা, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ : নিজ বাসভবন, ২০ অক্টোবর ২০১৪

আমি তখন ঘুম থেকে উঠেছি। সকালে কয়লা দিয়ে দাঁত মাজছিলাম। হাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একদল লোক আমাদের বাড়িতে আসে। তারা আমার আব্বাকে বলে, 'চলেন।' আব্বা পাল্টা প্রশ্ন করেন, কোথায় যেতে হবে? তারা বলে, 'কলোনীতে যেতে হবে।' আব্বা বিপদটি টের পেয়েছিলেন। আমাদেরকে তিনি ইশারায় সরে যেতে বলেন। লোকগুলোকে দেখি চারিদিকে তাকাচ্ছে। কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। পরে জেনেছিলাম, ওরা আসলে আমার বড় ভাই মুক্তিযোদ্ধা

আবদার রহমানকে ধরতে এসেছিল। ওরা তাকেই খুঁজছিল। আব্বার ইশারা পেয়ে আমরা ভাইবোনেরা বড় পুকুর পাড়ের দিকে দৌড়ে যাই।

একদল লোক আব্বাকে নিয়ে চলে যায়। আর একদল আমাদের বাড়িতে নির্বিচারে গুলি করতে শুরু করে। যে যেখানে পারছে ছুটে পালানোর চেষ্টা করছে। আমি একটি ঝোঁপের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখি। দৌড়াদৌড়ি। গুলি। আর্তচিৎকার। আতঙ্ক। সে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। সকলে পালাতে পারেনি। রাজাকারের দল আমাদের বাড়ি থেকে আমার বাবাসহ ছয়জনকে ধরে নিয়ে যায়। গ্রামের আরও অনেক পুরুষ সদস্যদের তারা ধরে নিয়ে যায়। পরে শুনেছি, তারা সেদিন মোট ৬১ জনকে ধরেছিল। এদের মধ্যে নিহত হন ষাট জন; রাজাকারদের হাতে ধৃত ও গুরুতর আহত সৈয়দ আবুল বাশার বেঁচে যান।

আফজাল হোসেন

পরে আরও জানতে পারি, তারা অনেকের লাশ ভৈরবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। আর ২২ জনকে দেয়াড়া গ্রামের তিনটি পৃথক স্থানে মাটিচাপা দিয়ে গণকবর দেয়। তাদের হাতে ওইদিন হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া সংখ্যাটি ষাট বলা হলেও এই সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। কারণ, দিনের আলো ফুটতে না ফুটতে যে হত্যাকাণ্ডের শুরু তা শেষ করতে তাদের প্রায় দুপুর হয়ে যায়। আক্রমণকারীদের হাতে এখানে স্থায়ী বসবাস করে না এমন মানুষও মারা পড়ে। ২২টি লাশ মাটিচাপা দেয়, তাদের সকলেরও পরিচয় আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। আর যাদের লাশ নদীতে ছুঁড়ে ফেলেছিল, তাদের পরিচয় তো জানাই যায়নি।

THE BANGLADESH OBSERVER

War babies leave for new homes

ZILLUR RAHMAN URGES PEOPLE

Devote to task of national reconstruction

যুদ্ধশিশুর খবর প্রকাশ করেছিল
ঢাকা থেকে প্রকাশিত
দি বাংলাদেশ অবজারভার

সংরক্ষণের প্রয়াস

১৯৭৫ পরবর্তী পরিস্থিতিতে মানুষ একাত্তরের ২৭ আগস্টে নারকীয় হামলা-নির্যাতনের কথা প্রায় ভুলতে বসেছিল। ৩৮ বছর পর ২০১০ সালের প্রথমদিকে আবারও সেই যন্ত্রণাদগ্ধ দিনটি মানুষের সামনে নতুন ভেসে ওঠে। ওই সময় সেখানে একটি কারখানা গড়ে তোলার কাজ চলছিল। মাটির কাজ করার সময় একটি গণকবরের সন্ধান মেলে। চিহ্নিত হয় ওই গণকবরটি একাত্তরের সময়কার ৩টি গণকবরের একটি। ওই গণকবরটি থেকে উদ্ধার হওয় কঙ্কাল এবং তাদের পরিধেয় বস্ত্র দেখে স্বজনেরা চিনতে পারেন, লাশটি কার। ওইদিন দেয়াড়ায় এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। দেয়াড়ার শহীদ ডা: মতিয়ার রহমানের বাড়িতে সেদিন আবারও কান্নার রোল ওঠে। মানুষের সামনে আবারও নতুনভাবে সেই পুরনো দিনটি আবির্ভূত হয়।

স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সেই গণকবরটি থেকে হাড়-গোর, শহীদদের পরিধেয় সামগ্রী তুলে আবারও একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তরিত করে সেখানে কবর দেয়া হয়। সেখানে একটি স্মৃতিফলকও উৎকীর্ণ করা হয়েছে। শহীদদের পরিধেয় এবং ব্যবহৃত সামগ্রীর নমুনা দেখে কয়েক জনের নামও ওই স্মৃতিফলকে লেখা হয়েছে।

এই ঘটনাটি সম্পর্কে তখন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হয়। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি খুলনা জেলা শাখার পক্ষ থেকে ২০১০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে খুলনায় দেয়াড়া গণহত্যা দিবস পালন করা হয়। ২০১১ সালের ওই দিনটিতে শহীদ পরিবারের সন্তানদের সম্মাননা জানানো হয়। দেয়াড়া গণহত্যা স্মরণে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। প্রতিবছর ওই দিনে সেখানকার বেদীতে শহীদদের স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনীর পক্ষ থেকে এই গণকবরটির অদূরে ২০১৩-এর ডিসেম্বর মাসে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে ইতিহাসবিদ প্রফেসর মুনতাসীর মামুন উপস্থিত ছিলেন। আরও ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য, আওয়ামী লীগ খুলনা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এসএম মোস্তফা রশিদী সুজা। ওই সভায় সারাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এসব গণহত্যাস্থলগুলো সংরক্ষণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের মর্মন্তুদ এই পর্বটির তথ্য সংরক্ষণের জন্যে গণহত্যা ও নির্যাতন বিষয়টিকে মুখ্য করে একটি আর্কাইভ গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়।

২০১০ সালে একটি গণকবর থেকে উদ্ধার করা হাড়-গোর এখানে কবর দিয়ে স্থানটি বাঁধাই করা হয়েছে এবং স্মৃতিতোরণে কয়েকজন শহীদের নাম উৎকীর্ণ করা হয়েছে

বর্তমান অবস্থা

দেয়াড়ার এই গণহত্যা ও তিনটি গণকবরের একটি– যা নতুনভাবে ২০১০ সালে কবর দিয়ে বাঁধাই ও কয়েকজন শহীদের নাম উৎকীর্ণ করা হয়েছে, সেখানেই প্রতিবছর ২৭ আগস্ট স্বজন, মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। আর রাজাকার ও গণহত্যায় অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে। প্রসঙ্গত, এই গণহত্যার বিচার দাবি করা হয়েছিল স্বাধীনতার পর পরই। দেয়াড়া গণহত্যায় শহীদ ডা: মতিয়ার রহমানের সন্তান মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবদার রহমান সেই সময়ে দৌলতপুর থানায় এই গণহত্যার বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটি (নং ৪২) ১৯ আগস্ট ১৯৭২ সালে দণ্ডবিধির ৩০২/৩৮০/৩২৫/৩২৬ এবং দালাল আইন ১৯৭২-এর আওতায় দৌলতপুর থানায় নথিভুক্ত করা হয়।

আবেদনে আবদার রহমান বলেন, তিনি একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। এসময়ে বাড়িতে আমার আব্বা, মা আত্মীয়-স্বজন রেখে যাই। তাঁরা নিরাপরাধ ছিলেন। পাকিস্তানের কুপুত্র রাজাকার বাহিনী আমার বাড়ি লুটপাট করে। পরিবারের সদস্য আমার পিতা ও স্বজনদের হত্যা করে। হত্যাকারীরা নগদ পাঁচ হাজার টাকাসহ জিনিসপত্র এবং লাইসেন্স (নং ৩৮৬৪ বন্দুক নং এফইউ ২, এসজি ১২) করা একটি বন্দুক নিয়ে যায়। ২৭ আগস্ট সকাল বেলায় তারা এই হত্যা ও লুটতরাজ করে।

এই মামলায় আসামী করা হয় ২১ জন রাজাকারকে। এরা হচ্ছে: ব্রহ্মগাতী গ্রামের আব্দুল গফুর, আবু বক্কর ও আবু জাফর; গোয়ালপাড়া গ্রামের শওকত হোসেন, সুগন্ধি গ্রামের মুন্সি হাবিবুর রহমান, পার হাজিগ্রামের আছাক মোল্লা এবং দেয়াড়া কলোনির ছবির হোসেন, হিয়াদ হোসেন, খলিলুর রহমান, তামাকু মৌলবী, মোটা শওকত, মুনসুর আলী, বন্দিসের বোনাই, সানাউল্লা, আলামিন, আনোয়ার হোসেন, মটকা কসাই, লকড়ু কসাই, হাবিব, আকবর ও হাবিবুর রহমান।

এই মামলার ২১ জন আসামীর মধ্যে ১৯ জন ইতোমধ্যে মারা গেছে। এখনও দুই জন বেঁচে আছে। এরা হচ্ছে দিঘলিয়া উপজেলার গোয়ালপাড়া গ্রামের বাসিন্দা শওকত হোসেন ও ব্রহ্মগাতি গ্রামের আবু জাফর। ইতোমধ্যে এই মামলার বাদী মুক্তিযোদ্ধা আবদার রহমানও মারা

গেছেন। একারণে আগের মামলাটির সূত্র ধরে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল হোসেন ওরফে ছোট খোকার স্ত্রী রোকেয়া বেগম বাদী হয়ে ২০০৯ সালের ৩০ জুন খুলনার বিজ্ঞ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আমলী আদালত ৩-এ একটি মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় আসামী করা হয় ওই জীবিত দুই রাজাকার– শওকত হোসেন এবং আবু জাফরকে। এরা উচ্চ আদালত হতে জামিন নিয়ে বহাল তবিয়তে আছে।

মূল্যায়ন

দেয়াড়ার গণহত্যায় অংশ নেয় পাকিস্তানি বাহিনী। তাদের সহযোগী ছিল পাকিস্তানি সমর্থক এদেশীয় রাজাকার ও অবাঙালি বিহারিরা। দিঘলিয়ার সেনহাটি একটি বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। সনাতন ধর্মাবলম্বী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ সেখানে বাস করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর্বে পাকিস্তানি সমর্থকগোষ্ঠী সেনহাটিসহ খুলনাঞ্চলে একাধিকবার হিন্দু জনগোষ্ঠীর বাড়ি-ঘর আক্রমণ করেছে। লুটপাট করেছে। অগ্নিসংযোগ করেছে। এলাকাবাসী একাধিকবার আক্রমণকারীদের প্রতিহত করেছে। হিন্দু পরিবারের একাধিক নারীকে ধরে নিয়ে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করেছে। উপর্যুপরি আক্রমণের মুখে হিন্দু জনগোষ্ঠী নিজেদের জন্মভিটেয় টিকে থাকার ইচ্ছেটি লালন করতে পারেনি। দেশত্যাগ করেছে।

মুসলিম লীগ নেতা খান-এ-সবুর অনুসারী গোয়ালপাড়া গ্রামের রাঙা মিয়ার ছেলে শওকত, কাওসার ও হাসান লুটপাট করে বেশ পরিচিতি পায়। কাওসার একজন হিন্দু নারীকে জোর করে তুলে নিয়ে বিয়ে করে। কথিত আছে, কাওসার ওই নারীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করতো। এক পর্যায়ে ওই নারী আত্মহত্যা করেন। এরপর কাওসার ওই নারীর বোনকে তুলে নিয়ে যায়। তাকেও বিয়ে করার চেষ্টা করে। ওই নারী তাতে রাজি না হলে তার ছোট ভাই হাসানের সাথে ওই নারীকে বিয়ে দেয়। ওই পরিবারের অনেক সম্পত্তি এরা আত্মসাত করে।

বলাবাহুল্য, একাত্তরের এপ্রিল ও মে মাস জুড়ে খুলনাঞ্চলের হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর একের পর এক আক্রমণ ঘটেছে। লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের পাশাপাশি হিন্দু নারী বিশেষত: যুবতী-অবিবাহিত নারীদের অপহরণ ও নির্যাতন করা একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়। এ থেকে রক্ষা পেতে যারা জীবন নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, তারাও আক্রমণের শিকার

হয়েছে। গণহত্যার শিকার হয়েছে। দিঘলিয়ার একদল হিন্দু নর-নারী ভারতের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্যে বেরিয়ে ভৈরবের পূর্বপাড়ে ফুলবাড়ি গেইট এলাকায় নির্মম গণহত্যার শিকার হন। আশ্রয়প্রার্থীরা পথে গণহত্যার শিকার হয়েছেন নানা জায়গায়। বটিয়াঘাটার বাদামতলা; দাকোপের চালনা, বাজুয়া ও হড্ডা; রামপালের ডাকরা; ডুমুরিয়ার চুকনগর; সাতক্ষীরার ঝাউডাঙ্গা প্রভৃতি এক একটি গণহত্যাস্থল। ভিন্ন এলাকার মানুষগুলো এসব জায়গায় গণহত্যার শিকার হওয়ায় এদের প্রায় কারোরই নাম-ঠিকানা-পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি।

খুলনাঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী গোষ্ঠীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন মুসলিম লীগ নেতা খান এ সবুর। সবুর অনুসারীরাই এখানে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, গণহত্যায় মূল ভূমিকা পালন করেছে। অবশ্য, মে মাসেই খুলনাতে প্রথম রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়। খুলনা শহরের আনসার ক্যাম্পে (ভূতের বাড়ি) জামায়াতে ইসলামী নেতা মাওলানা এ কে এম ইউসুফ তাঁর ৯০ জন অনুসারী নিয়ে রাজাকার বাহিনীর সূচনা করেন।

এসব ঘটনায় হত-বিহ্বল মানুষর প্রতিরোধে জেগে উঠে। যুবকেরা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আবির্ভূত হয়। ততোদিনে মুসলিম লীগ অনুসারীরা রাজাকার হিসেবে নাম লিখিয়েছে। দিঘলিয়ার গোয়ালপাড়া গ্রামের সবুর-ভক্ত শওকতও রাজাকার হিসেবে পরিচিতি পায়। রাজাকারদের দমনে যেমন মুক্তিযোদ্ধারা তৎপর ছিল, তেমনি মুক্তিযোদ্ধাদের নিশ্চিহ্ন করতে রাজাকাররাও সদা সচেষ্ট ছিল।

দেয়াড়া গ্রামের ডা: মতিয়ার রহমানের ছেলে আবদার রহমান ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। গেরিলা হিসেবে পারদর্শী এই মুক্তিযোদ্ধাকে দমন করতে রাজাকাররা মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা খবর রাখছিল, আবদার কখন গ্রামে আসে। কারণ ওই গ্রামের বাড়িতে শুধুমাত্র তার মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা নন, অনেক আত্মীয়-স্বজনও ছিলেন। তাঁদের সাথে যোগাযোগের জন্য আবদার আসতেন। গ্রামের ছেলেদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সংগ্রহ করতেন। একারণে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী গোষ্ঠী আবদারকে দমনে মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা ২৭ আগস্ট মুক্তিযোদ্ধা আবদারের বাড়ি আক্রমণ করে। প্রকৃতপক্ষে দেয়াড়া গ্রামের মানুষ এজন্যে একেবারে প্রস্তুত ছিল না। স্বাভাবিকভাবে ধারণা ছিল, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বাস এই গ্রামটিতে পরিকল্পিত কোনো আক্রমণ ঘটবে না। আক্রমণকারীরা মুক্তিযোদ্ধা আবদারকে ধরতে পারেনি; আর তাঁকে ধরতে না পারার ব্যর্থতার রোষ মিটিয়েছে নিরীহ গ্রামবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। নৃশংসতার চিহ্ন এখনও বয়ে চলেছেন বয়োবৃদ্ধ আবুল বাশার।

দেয়াড়া অঞ্চলে নকশালপন্থীদেরও প্রভাব ছিল। তবে প্রভাব-কর্তৃত্ব বেশি ছিল মুক্তিযুদ্ধবিরোধী মুসলিম লীগ-জামায়াতী-রাজাকার-অলবদরদের। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই মুক্তিযুদ্ধবিরোধী নেতৃস্থানীয়রা গা-ঢাকা দেয়। ১৯৭৫-এর পর পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তারা ফিরে আসে এবং দাপটে তাদের হারানো কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। আর ভয়ে সিঁটিয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকগোষ্ঠী। একারণে দেয়াড়া গণহত্যার এই মর্মন্তুদ পর্বটিও আড়ালে চলে যায়। অনেকেই বলতে থাকেন, পুরনো ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়; সবকিছু ভুলে মিলে-মিশে চলা উচিত। একারণে এই গোষ্ঠীটি পরিকল্পিতভাবে হত্যা, নির্যাতন পর্বের ভৌগোলিক নিদর্শনগুলো ধ্বংস করতে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন হত্যা-নির্যাতনের এই বেদনাদায়ক পর্ব আড়াল করার চেষ্টা শুধু দেয়াড়ায় ঘটেছে এমন নয়; এই চেষ্টা গোটা খুলনাঞ্চলেই ছিল, সারাদেশেই ছিল। খুলনা সার্কিট হাউসের পিছনে হেলিপ্যাডের বিশ্রামাগারটি– যেটি ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতন কেন্দ্র, তার স্মৃতিচিহ্ন আজ আর নেই; সেখানে গড়ে উঠেছে সার্কিট হাউসের নতুন ভবন। সময়ের কারণেই নতুন ভবন গড়ে উঠতে পারে, তাই বলে ইতিহাসের সাক্ষী, কালের সাক্ষী ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে হবে! নতুন ভবনে একটি ফলক লাগিয়েও চিহ্নিত করা হয়নি যা মুক্তিযুদ্ধকালীন গণহত্যা-নির্যাতনের বিশেষ সাক্ষ্যবহ।

কিন্তু স্বজন হারানোর বেদনা কি ভোলা যায়? গণহত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধ যারা করেছে, তাদের অপরাধ কি ক্ষমা করা যায়? না-কি যারা স্বজন-সম্পদ হারিয়েছেন, তাঁদের কষ্ট-যন্ত্রণা অস্তমিত সূর্যের ন্যায় দিন চলে গেলেই প্রশমিত হয়? দুঃখ-যন্ত্রণা-কষ্ট ভোলার নয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন বেদনার গাঁথা কখনও ভুলে যাওয়ার নয়।

তথ্যপঞ্জি

গ্রন্থ

দিঘলিয়া (দেয়াড়া) গণহত্যা; সম্পাদনা: গৌরাঙ্গ নন্দী, ২০১১, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, খুলনা

সাক্ষাৎকার

আফজাল হোসেন, পিতা: মতিয়ার রহমান। গ্রাম: দেয়াড়া, ডাকঘর: দিঘলিয়া। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ২০ অক্টোবর ২০১৪

জিন্নাত হোসেন, পিতা: আব্দুল সামাদ শেখ; গ্রাম: দেয়াড়া, ডাকঘর: দিঘলিয়া, জেলা: খুলনা। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ২০ অক্টোবর ২০১৪

সৈয়দ আবুল বাশার, পিতা: সৈয়দ মকিম আলী; গ্রাম: দেয়াড়া, ডাকঘর: দিঘলিয়া, জেলা: খুলনা। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ : নিজ বাসভবন, ২০ অক্টোবর ২০১৪

সৈয়দ ওবায়দুল হক হিরু, পিতা: সৈয়দ আবুল বাশার; গ্রাম: দেয়াড়া, ডাকঘর: দিঘলিয়া, জেলা : খুলনা। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ : নিজ বাসভবন, ২০ অক্টোবর ২০১৪

শেখ মনিরুল ইসলাম, পিতা: শেখ মো: হোসেন আলী, গ্রাম: সেনহাটি, বিদ্যাবাগীশ পাড়া, দিঘলিয়া। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪